বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার
মুখপত্র
দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সংকলন
জুলাই-আগষ্ট, ১৯৭৮
দাম : ৫০ পয়সা

● সাধারণ সম্পাদকের বিবৃতি—১ ● কুষ্ঠরোগ : সমাজ ও বিজ্ঞানের চোখে—৩ ● চীনের ইলেকট্রনিক শিল্প—৬
● Reorientation of Applied Science and Technology—৭ ● ফলিত রসায়ন ডিগ্রী—একটি বিতর্ক—১৫
Interntional Cancer Congress—a call for Boycott—১৭ ● চিঠিপত্র—১৯

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভায় সাধারণ সম্পাদকের বিবৃতি

[Excerpts from the Secretarial report presented at the Annual General Meeting ('78) of the S W F (WB), held in the Applied Physics Department of Calcutta University on May 27, are being published here in lieu of the editorial.]

মাননীয় অতিথি, সদস্য এবং বন্ধুগণ,

Scientific Workers' Forum, West Bengal বা, পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য আপনাদের আমি আমার এবং ফোরামের কার্য নির্বাহক সমিতির পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আপনারা জানেন গতবছর ১৫ই মে'তে ফোরামের প্রথম সাধারণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সম্মেলনে ফোরামের খসড়া সংবিধান এবং কার্যসূচী সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং ১৯৭৭-৭৮ সালের জন্য একটি কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হয়। গত কবছরে এই কার্যকরী সমিতি আপনাদের এবং অন্যান্যদের সহযোগিতায় যে কাজগুলো করতে পেরেছেন, আমি আপনাদের কাছে তার একটি তালিকা পেশ করছি।

(১) আমাদের ফোরামের পক্ষ থেকে 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' নামে দ্বিভাষিক, দ্বিমাসিক পত্রিকা নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। আশাকরি, আপনারা নিশ্চয়ই নিয়মিত এই পত্রিকা পাচ্ছেন।

(২) এই বছরে তিনটি আলোচনাচক্রের আয়োজন আমাদের ফোরামের তরফ থেকে করা হয়েছে। গতবছর অক্টোবর মাসে I. S. I.-তে "CSIR এর প্রস্তাবিত পুনর্গঠনের" ওপর একটি, এ বছর জানুয়ারী মাসে বোস ইনস্টিটিউটে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ওপর একটি এবং মে মাসে ফলিত রসায়ণ বিভাগে "নিউক্লিয়ার যন্ত্রপাতি দ্বারা গুপ্তচরবৃত্তি ও নিউক্লিয়ার যন্ত্রজনিত ক্ষতিসাধন" এর ওপর আর একটি আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়।

(৩) বিড়লা কলেজ অফ্ সায়েন্স এবং এডুকেশনের দুই অধ্যাপক শ্রীদীপাঞ্জন রায়চৌধুরী এবং শ্রীবি. পি. সিংকে অন্যায়ভাবে বরখাস্ত করার প্রতিবাদে বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপক শ্রীসুপ্রভাত মুখার্জীর বিরুদ্ধে (যাঁর তদন্তের রিপোর্টের ভিত্তিতেই ঐ দুইজন অধ্যাপককে বরখাস্ত করা হয়) বিজ্ঞান কলেজে ফোরামের তরফ থেকে এক বিক্ষোভের আয়োজন করা হয়। এই বিক্ষোভে বিজ্ঞান কলেজের ছাত্র এবং কর্মচারীরা অংশগ্রহণ করেন। এর ফলে সুপ্রভাত বাবু তাঁর কৃতকর্মের জন্য লিখিতভাবে দুঃখ প্রকাশ করেন।

(৪) স্বয়ংশাসিত কিন্তু অবিধিবদ্ধ (autonomous non-statutory) বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রগুলোতে কর্মচারীগণের সাথে কর্তৃপক্ষের অগণতান্ত্রিক প্রভু ভৃত্য সম্পর্ক বজায় রয়েছে এবং কর্তৃপক্ষের অন্যায়

কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার কর্মচারীদের নেই—এই অসহনীয় অবস্থা অবসানের উদ্দেশ্যে ফোরামের তরফ থেকে বিভিন্ন বিজ্ঞান গবেষণাকেন্দ্রের কর্মচারী সমিতির সঙ্গে আলোচনার সূত্রপাত করা হয়। এবছর ৮ই মার্চ জিওলজিকাল সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়ার কৃষ্ণান হলে প্রায় শতাধিক বিজ্ঞানকর্মীদের উপস্থিতিতে স্বয়ংশাসিত বিজ্ঞান গবেষণাকেন্দ্রগুলোতে এই প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক বিলোপ এবং গণতন্ত্রীকরণের উদ্দেশ্যে আন্দোলন গড়ে তোলার প্রচেষ্টাকে ফোরামের তরফ থেকে স্বাগত জানানো হয়।.....

(৫) গত এক বছরে বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত আলোচনাচক্র এবং কার্যসূচীতে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা আমন্ত্রিত হয়েছেন এবং অংশগ্রহণ করেছেন।.....

এই বছর আমাদের কার্যনির্বাহক সমিতির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল ফোরামের একটি সাংগঠনিক কাঠামো দেওয়া, এ ব্যাপারে আমরা কিছুটা সাফল্য অর্জন করেছি। ফোরাম Society of Registration Act-এ এ রেজিষ্টার্ড হয়েছে। ভারতীয় বিজ্ঞানকর্মীদের কেন্দ্রীয় সংস্থা "Association for the Scientific Workers of India" কর্তৃক আমরা অনুমোদিত হয়েছি। ফোরামের মুখপত্র "বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী" নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বিভিন্ন বিজ্ঞান গবেষণাগার এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রায় দুই শতাধিক সদস্য ফোরামে রয়েছেন।.....

অপরপক্ষে, এখনও পর্যন্ত ফোরামের অন্যতম প্রধান দুর্বলতা হচ্ছে—আমাদের ঘোষিত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যগুলি সাধন করার জন্য কোন নির্দিষ্ট কার্যসূচী আমরা এখনও পর্যন্ত গ্রহণ করে উঠতে পারিনি।

গত একবছরের এবং তারও পূর্ববর্তী কয়েক বছরের কার্যক্রম এবং আলোচনার ভিত্তিতে বর্তমান কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যগণ সংস্থার আশু কার্যক্রম সম্পর্কে ঐক্যমত হয়েছেন। তাঁদের মতে সংস্থার প্রধান এবং প্রাথমিক কাজ হচ্ছে—প্রথমতঃ বিজ্ঞানকর্মীদের সামাজিক চেতনা এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার জন্য নিরবিচ্ছিন্ন প্রচার কার্য চালিয়ে যাওয়া। এ ব্যাপারে আমাদের সংস্থার মুখপত্র "বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী" কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ বিজ্ঞানকর্মীদের নিজস্ব দাবী দাওয়ার আন্দোলন, ট্রেড ইউনিয়নের আন্দোলন, গণতান্ত্রিক ও মানবতার অধিকারের আন্দোলনের সঙ্গে যখন যতটুকু সম্ভব সংস্থাকে যুক্ত রেখে বিজ্ঞানকর্মীদের ধীরে ধীরে সংগঠিত করতে হবে—তাঁদের নিয়ে গড়ে তুলতে হবে ঐক্যবদ্ধ ও সচেতন একটি আন্দোলন, যেটিকে আবার যুক্ত রাখতে হবে সমাজবদলের আন্দোলনের সাধারণ ধারার সঙ্গে। মনে রাখতে হবে বিজ্ঞানের সঙ্গে সমাজের যোগাযোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। সমাজের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামো নির্ধারিত করে বিজ্ঞানের গতিপ্রকৃতি ও চরিত্রকে। আত্মনির্ভর ও বলিষ্ঠ বিজ্ঞানের বিকাশের অন্যতম পূর্বসর্ত হচ্ছে সংস্কারমুক্ত শোষণমুক্ত একটি সমাজ। কাজেই বিজ্ঞানের উন্নতির জন্যই প্রতিটি বিজ্ঞানকর্মীকে শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের প্রক্রিয়ার সঙ্গে নিজেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত রাখতে যথাসম্ভব চেষ্টা করতে হবে।

এই দুই ধরণের কাজ পরস্পরের বিরোধী তো নয়ই বরং, একে অন্যের পরিপূরক—একের সাফল্য অন্যের সাফল্যের সর্ত। একথা ভাবা নিছক মূর্খামি যে বিজ্ঞানকর্মীদের দৈনন্দিন আন্দোলনের বাস্তবতা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখে সংস্থা কেবল জ্ঞানবিতরণ করে তার ঘোষিত লক্ষ্যে পৌছানোর ব্যাপারে বিজ্ঞানকর্মীদের সমর্থন ও সক্রিয় সহযোগিতা পাবে। আবার অন্যদিকে বিজ্ঞান কর্মীদের সবচেয়ে বড় শত্রু তাঁদের সামাজিক সচেতনতার অভাব—তার বিরুদ্ধে লাগাতার প্রচার চালিয়ে যেতে হবে। নতুবা যে কোন গণআন্দোলনই নিছক অর্থনৈতিক দাবীদাওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

এই সমস্ত চিন্তাধারার ভিত্তিতে যে ন্যূনতম কর্মসূচীর কথা বর্তমানে কার্যনির্বাহক সমিতি ভেবেছেন তা হোলো :

(১) ফোরামের মুখপত্র "বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী"কে আরও সমৃদ্ধ ও প্রাণবন্ত করে তুলতে হবে এবং এর প্রচার যতদূর সম্ভব বাড়াতে হবে।

(২) স্বয়ংশাসিত কিন্তু অবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলোতে ঘৃণ্য "প্রভু-ভৃত্য" সম্পর্ক বিলোপের জন্য ও কাজকর্মে গণতন্ত্রীকরণের জন্য যে ন্যায়সঙ্গত আন্দোলন গড়ে উঠেছে তার অংশীদার ফোরাম হবে এবং এই আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য যথাযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।

(৩) কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাছাই করে সেই সম্পর্কে ছোটো ছোটো পাঠচক্র ফোরাম গড়ে তুলবে। উদাহরণ স্বরূপ—জাতীয় বিজ্ঞান পরিকল্পনা, বিদ্যুৎ সমস্যা, শক্তি সঙ্কট, খাদ্যে ভেজাল, প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং তার প্রতিকার, বিজ্ঞান গবেষণাগারে ও শিল্পসংস্থায় বিজ্ঞান ও কারিগরী কর্মীদের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও রাসায়নিক দ্রব্যজনিত ক্ষতি, ঔষধ সমস্যা, কারিগরী বিদ্যা আমদানি ইত্যাদির নাম করা যেতে পারে।

(৪) ফোরামের উদ্যোগে সময়োপযোগী ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর নিয়মিতভাবে আলোচনাচক্র আয়োজন করতে হবে এবং অন্যান্য সমধর্মী বা বন্ধুভাবাপন্ন সংস্থাগুলি কর্তৃক আয়োজিত আলোচনাচক্রে যথাসম্ভব অংশগ্রহণ করতে হবে। এই সমস্ত আলোচনাচক্র যাতে প্রাণবন্ত ও ফলপ্রসূ হয় তার জন্য ফোরামকে যথাযোগ্য প্রস্তুতি ও উদ্যোগ নিতে হবে। বিশেষ করে বিভিন্ন Science Club-এর সঙ্গে ফোরামের যোগাযোগ আরও ঘনিষ্ঠ করে তুলতে হবে।

(৫) বিভিন্ন বিজ্ঞান ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞান গবেষকদের সমস্যা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ফোরামকে এই সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে যথাসম্ভব উদ্যোগী হতে হবে।

এই পাঁচটি প্রধান কাজ ছাড়াও ফোরামের উদ্যোগে নিরক্ষরতা দূরীকরণ, ছোট ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠানকে কারিগরীবিদ্যা দিয়ে সহায়তা ইত্যাদি কাজকর্ম চলতে পারে। কোন কোন সদস্য যদি নিজেদের উদ্যোগে এই কাজগুলি হাতে নেন, ফোরাম সেই প্রচেষ্টাকে যথাসম্ভব সাহায্য করার চেষ্টা করবে।

পরিশেষে, নানা ভুলত্রুটী এবং দুর্বলতা সত্ত্বেও সার্বিক বিচারে এই এক বছরে ফোরামের অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য বলে আমরা মনে করি। আমরা আশা করব, আপনাদের সকলের সহায়তায় ও প্রত্যক্ষ সমর্থনে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা সুস্থ এবং দীর্ঘজীবন লাভ করে আমাদের দেশের সর্বক্ষেত্রে বিশেষ করে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা অর্জন ও গণতান্ত্রিকতা বিকাশের জন্য, বিজ্ঞান কর্মীদের নানা প্রকার সমস্যা প্রতিকারের জন্য, তাঁদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সামাজিক চেতনা গড়ে তোলার জন্য নিরবিচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। [সংক্ষিপ্ত বয়ান]

স্বাঃ **হিরণ্ময় সাহা**
বিদায়ী সম্পাদক

কুষ্ঠরোগ ঃ সমাজ ও বিজ্ঞানের চোখে

[The following is the text of a talk delivered at the Indian Statistical Institute by Ratanlal Brahmachari in memory of late Harichand Babu, an employee of that Institute who died after a long spell suffering from leprosy. Recently, a considerable number of persons attached to another leading scientific institution of Culcutta have been found afflicted with the disease. This article discusses some social and scientific issues in connection with the disease that need wide circulation, specially among the people of our country who still hold a superstitious dread to it.]

যুগ যুগ ধরে পৃথিবীর নানা দেশেই কুষ্ঠরোগ মানুষের জীবনে এক ভয়াবহ অভিশাপ। আফ্রিকা, এশিয়া, দক্ষিণ আমেরিকার মত দেশে আজও এরোগ রয়ে গেছে। কিন্তু আজকের উত্তর আমেরিকা বা ইউরোপে এ শুধু দুঃস্বপ্নের স্মৃতি। 'বেনহুর' বইটি একটি ধ্রুপদী সাহিত্য। এর ছায়াচিত্র আমরা অনেকেই দেখেছি। এই গল্পটি খ্রীষ্টের জীবনের সমসাময়িক পটভূমিকায় রচিত। কুষ্ঠরোগের বিভীষিকা এখানে স্পষ্ট-ভাবে ফুটে উঠেছে। এরোগে আক্রান্ত ব্যক্তি সমাজ থেকে বিতাড়িত হয়ে ঘৃণিত জীবন যাপন করতে বাধ্য হতো। গেহেনা ও হিন্নম গ্রাম দুটি ছিল কুষ্ঠরোগী অধ্যুষিত অঞ্চল। হিব্রুভাষায় 'গেহেনা' কথাটির অর্থ হলো নরক। বাস্তবিক গেহেনা হিন্নম মনে করিয়ে দেয় জাহান্নম কথাটি। প্রকৃতপক্ষে, পৃথিবীতে এই অঞ্চল নরকই ছিল।

এবার দু'হাজার বছর পেরিয়ে চলে আসুন আজকের দিনে। পশ্চিম-বঙ্গের এক কুষ্ঠরোগী, বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক, লিখেছেন তাঁর আত্মজীবনী। আমাদের এক সহকর্মীর সাথে তাঁর আলাপ হতে বললেন, আমরা যারা কুষ্ঠরোগী বা কুষ্ঠরোগ থেকে ভালো হয়ে উঠেছি, আপনাদের ওই সুস্থ সমাজকে এখন ঘৃণা করি। শিক্ষক মহাশয়ের আত্মজীবনী পড়লে বোঝা যায় এই অনুযোগের ভিত্তি কোথায়। একদিন তিনিও ছিলেন সুঠাম দেহের অধিকারী এক যুবা পুরুষ। বিয়েও ঠিক হয়েছিল। হয়তবা রঙীন স্বপ্নের নেশায় ভরপুরও হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর শরীরে প্রকাশ পেলো এই কালব্যাধি। চলে এলেন কুষ্ঠ হাসপাতালে। বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজন তাঁর সংস্রব পরিত্যাগ করলো। কিছুদিন চিকিৎসার পর মুখখানা বিকৃত হয়ে গেলেও কিছুটা ভালো হয়ে উঠলেন। এরপর যা ঘটলো তা স্বাভাবিক। বাইরের সমাজে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা না করে ওখানে অন্য রোগীদেয় সেবা করার উদ্দেশ্যে নার্সের কাজ নিলেন। সেই প্রায় অসম্ভব ঘটনাটিই একদিন ঘটলো। যে মেয়েটির সাথে তাঁর বিয়ে স্থির হয়েছিল তিনি শরীরে কুষ্ঠ রোগের লক্ষণ নিয়ে এলেন এই হাস-পাতালে। কয়েকবছর পর তিনিও সেরে উঠলেন। পুনরায় বিকশিত হলো প্রেমের কুসুম।

শতাব্দীর পর শতাব্দী পৃথিবীর ইতিহাসে কত এরকম ঘটনা ঘটেছে। আবার এও ঘটেছে স্ত্রী বা পুরুষের তাদের প্রিয়তম বা প্রিয়-তমার সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হওয়ার ঘটনা। অনেকদিন আগে এক আমেরিকান ভদ্রলোক শরীরে এই রোগের চিহ্ন দেখতে পেলেন। বিদেশে থাকাকালীন তাঁকে এই রোগ আক্রমণ করেছিল। আমেরিকার একটি ছোট শহরে এক ডাক্তারের কাছে যেতেই ডাক্তার ভয়ে লাফিয়ে উঠলেন।

ঘরের বাইরে থেকে তালা বন্ধ করে চলে গেলেন। এক বিশেষ ভাবে তৈরী ঘরের চারদেওয়ালের মধ্যে বন্দী অবস্থায় কাটল ভদ্রলোকের শেষ-জীবন। তবে নিঃসঙ্গ জীবনে ছিল এক পরম সান্ত্বনা। পুরু দেওয়ালের ওপার থেকে তাঁর স্ত্রী বাজিয়ে যেতেন যন্ত্রসংগীত, 'তোমার সন্ধ্যা ছিল প্রদীপহীনা / আধার দুয়ারে তব বাজানু বীণা'। ভারতের প্রাচীন শাস্ত্রেও নজীর আছে সাধ্বী স্ত্রী কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত স্বামীর পরিচর্যা করে প্রশংসিত হয়েছেন। আর একটি অষ্ট্রেলিয়ান আদিম অধিবাসীর কথা মনে পড়ছে। স্ত্রী তাঁর কুষ্ঠরোগগ্রস্ত স্বামীকে লুকিয়ে রেখে সেবা করতেন। একবার যখন সেই মহিলা দূরে শহরের পথে চলেছেন তখন পুলিশ জানতে পেরে স্বামীকে নিয়ে চলে গেল বহুদূরের কোন হাসপাতালে। সারা জীবনের মত তাঁর সাধ্বী স্ত্রীর সঙ্গলাভ শেষ হয়ে গেল।

প্রশ্ন হলো, মানুষের জীবন থেকে কী করে এই অভিশাপ দূর করা যায়। কলেরা, বসন্ত, প্লেগ ইত্যাদির মত কুষ্ঠরোগ অনেক দেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছে যেখানে এক সময় ছিল এই রোগের প্রচণ্ড প্রকোপ।

	কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা	স্থান
সূত্র : ১৯৬৫ WHO	৩৮ লক্ষ	আফ্রিকা
	৬৪ "	এশিয়া
	৫২ হাজার	ইউরোপ
		(বাস্তবিক পক্ষে দক্ষিণ ইউরোপ)
সূত্র : ১৯৭৫ আকাশবাণী	৩ থেকে ৪ কোটি	সমগ্র পৃথিবী
	৫০ লক্ষ	ভারত
	৫ লক্ষ	পশ্চিম বাংলা

অন্যান্য সূত্র: (১) আসানসোলের জনসংখ্যার শতকরা ৪ ভাগ কুষ্ঠরোগী। (২) বোম্বাই পৌর এলাকার স্কুল ছাত্র ছাত্রীর শতকরা ১ ভাগ কুষ্ঠরোগী।

ঐতিহাসিক তথ্যাবলী :

শুশ্রুতা সংহিতায় আছে যে কুষ্ঠ একটি ছোঁয়াচে রোগ। এমনকি এই ধারণাও ছিল, যে লোক এই জন্মে কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়েছে সে পর-জন্মেও আবার কুষ্ঠরোগী হয় (এই বক্তৃতা শুনে একটি হিন্দীভাষী অঞ্চলের লোক আমাদের বলেছিলেন যে তাঁর গ্রামে এখনও অনেকের এই ধারণা রয়ে গেছে)। ৯৮২ খ্রীষ্টাব্দের প্রাচীন জাপানী চিকিৎসা শাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে কুষ্ঠ একটি ছোঁয়াচে রোগ। ১২৩৫ খ্রীষ্টাব্দে হাঙ্গেরীর রাজকন্যা এলিজাবেথ মাত্র ১৪ বছর বয়সে জার্মানীর রাণী হয়ে এলেন। এবং মাত্র ২৪ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি কুষ্ঠরোগীদের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। মৃত্যুর পর তাঁকে Saint বলে ঘোষণা করা হয়। ১২৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ বিধান দিলেন সমস্ত কুষ্ঠরোগীদের একত্র করে পুড়িয়ে মারা হোক। যাতে দেশ থেকে এই রোগ নির্মূল হয়। ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগাল ও স্পেন থেকে দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকাতে রোগটি ছড়িয়ে পড়ে।

১০০-৯০০ শতাব্দীতে ভারতের আশ্চর্য ঔষধিবৃক্ষ চালমুগরার কথা পৃথিবীর নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে Mouat সাহেব আধুনিক চিকিৎসায় এর প্রচলন করেন। পরে রাসায়নিকরা দেখেছেন যে ভেষজগুণসম্পন্ন পদার্থ দুটি হচ্ছে এক বিশেষ ধরণের fatty acid (চালমুগরিক acid ও Hydnocarpic acid)। অনেকদিন যাবৎ কুষ্ঠরোগের একমাত্র ঔষধ ছিল এই চালমুগরা বা তার থেকে নিষ্কাশিত ঔষধ। নরেওজীয় বিজ্ঞানী দানিয়েলসন যিনি অল্পের জন্য কুষ্ঠরোগের জীবাণু আবিষ্কার করতে পারলেন না (যেটা করলেন হানসন্), তিনি নিজে ছিলেন একজন যক্ষ্মারোগী। অল্পবয়সে রোগের প্রকোপে তিনি সামান্য কম্পাউণ্ডারীর চাকরী ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। কিন্তু পরে যক্ষার সঙ্গে যুঝতে যুঝতে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডী পেরিয়ে বিজ্ঞানী ডাক্তার হলেন। তাঁর গবেষণার প্রধান বিষয় ছিল কুষ্ঠ। প্রাণীতত্ত্ববিদদের মতো জাহাজ থেকে নানা সামুদ্রিক প্রাণী সংগ্রহ করে পর্যবেক্ষণ করতেন। ন'জন স্বেচ্ছাসেবকের সঙ্গে তিনি কুষ্ঠের গুটিকা থেকে নির্যাস নিয়ে নিজেদের শরীরে প্রবিষ্ট করালেন। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে Profeta, Cagnina এবং আরও আটজন লোক আবার নিজেদের ওপর এই পরীক্ষা চালালেন। প্রাতঃস্মরণীয় এই বিশজন লোক। কি মহান তাঁদের এই আত্মদান! কিন্তু এই বিশজনের একজনও কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হলেন না জীবনের শেষদিন পর্যন্ত। রোগীর দেহ বা গুটিকা ঘাঁটতে ঘাঁটতে বহু চিকিৎসক ও শল্য চিকিৎসক দুর্ঘটনাক্রমে হাত কেটে ফেললেন। কিন্তু তাঁদেরও দেহে এই রোগ সংক্রামিত হয়নি। এটা প্রমাণ করে এক দেহ থেকে আর এক দেহে এই রোগ খুব সহজে ছড়িয়ে পড়ে না।

অন্য অনেক রোগের তুলনায় কুষ্ঠরোগ অনেকটা কম ছোঁয়াচে। কিন্তু সংক্রমণের ভয় কিছুটা আছে।

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দ। বেলজিয়ান যাজক দামিয়েন Molakai দ্বীপের কুষ্ঠরোগীদের সমাজে স্বেচ্ছানির্বাসন নিলেন। বহুবৎসর যাবৎ বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল একটি মাত্র নৌকার মারফত, যাতে ঔষধ, বস্ত্র প্রভৃতি চলে আসতো। বহুবৎসর পরে তাঁর শরীরে কুষ্ঠরোগ প্রকাশ পায়। মৃত্যুর পরে তাঁকে Saint ঘোষণা করা হয়।

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দ। বেশ কয়েকজন বিদেশী মিশনারী ও তাঁদের সঙ্গে কয়েকজন মহিলা ভারতে কুষ্ঠরোগীদের সেবা করতে এলেন। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে Cochrane কুষ্ঠরোগীদের চিকিৎসা জগতে এক পথিকৃৎ হিসাবে দেখা দিলেন। Dapsone নামক sulfone ঔষুধটির তিনিই প্রবর্তক।

আজ পর্যন্ত কুষ্ঠরোগীর এইটিই মহৌষধ।

তিন হাজার একশ তেরোজন রোগীদের চালমুগরা তেল দিয়ে চিকিৎসা করা হয়েছিল। এদের মধ্যে শতকরা ৮৭ জনের কিছুটা উপকার হয়। Hydnocarpic acid ও কিছুটা ফলপ্রসূ হয়। তবে Dapsone-এর তুলনায় অনেকটাই কম।

১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে কামপালার একটি আন্তর্জাতিক অধিবেশনে আশার বাণী শোনা যায়। Dapsone একটি অতি দ্রুত নিরাময়কারী ঔষধ—এই সিদ্ধান্ত হল। কিন্তু এটি খুব সতর্কভাবে যাচাই করে দেখতে হবে। যে ২২ জন রোগীকে প্রথম Dapsone দিয়ে চিকিৎসা করা হয় তাঁদের মধ্যে ১৮ জন নিরাময় হলো। ৩০ বছর পরে আবার তাঁদের সন্ধান করা হয়। তখন তাঁদের ৫ জন পরলোকে। বাকী ১৩ জনের মধ্যে ১০ জনের রোগের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। কাজেই Dapsone এর চিকীৎসা অত্যন্ত দীর্ঘমেয়াদী। ৬০৯ জন রোগীর ওপর আর একটি সমীক্ষায় দেখা যায়Dapsone চিকিৎসায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জীবাণু মুক্ত হতে সময় লাগে চার বছরের মতো। তবে শতকরা ১৭ জনের জীবাণু মুক্ত হতে সময় লেগেছিল ২ বছর। অল্প সংখ্যক রোগীর ক্ষেত্রে ওষুধটি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। ব্রাজিলে এরকম আর একটি ২০ বৎসর ব্যাপী সমীক্ষায় দেখা যায় জীবাণু মুক্ত হতে ৫ বছর বা তারও বেশী সময় লাগে। কিছু কিছু লোক আছেন যাঁরা Sulfone জাতীয় ঔষধ সহ্য করতে পারেন না। তাঁদের জন্যে কিছুটা ফলপ্রসূ দুই একটি অন্য ঔষধ বের করা গেছে। এখানে দেখা গেল Dapsone চিকিৎসায়ও কুষ্ঠ জীবাণু পুনরায় বংশবৃদ্ধি করতে পারে।

হানসনের একশত বছর পরে একটি প্রাণী খুঁজে পাওয়া গেল যার শরীরে কুষ্ঠরোগ সংক্রামিত করে নানা গবেষণা করা যায়। মানুষ এবং নানা প্রাণীর ভেতরে ইচ্ছামত কুষ্ঠরোগ সংক্রামিত করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে Binford লক্ষ্য করলেন যে প্রাচীন কাল থেকে জানা আছে মানুষের শরীরে কান, নাক ও আঙ্গুলগুলো কুষ্ঠ বীজাণুর সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান। আসল কথা, শরীরের মধ্যে এইগুলিই তুলনা-মূলকভাবে বেশী ঠাণ্ডা। আমরা জানি এগুলি ঠাণ্ডা হওয়ার কারণ হচ্ছে যে এর পৃষ্টফল অনেকটা বেশী। শরীরতত্ত্বে একটি সাধারণ নিয়ম আছে যে একই জাতীয় প্রাণীর দেহের আয়তন শীতের দেশে হবে বড়, গরমের দেশে হবে ছোট। কিন্তু কানের আকার আপেক্ষিক ও চরমভাবে উষ্ণ অঞ্চলেই আরও বড়। যেমন কানাডার Timber wolf জাতীয় নেকড়ে বা মেরু অঞ্চলের শেয়ালের থেকে উষ্ণ অঞ্চলের নেকড়ে বা মরু-ভূমির শেয়ালের শরীর ছোট কিন্তু কানের আকার অনেক বড়। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে Sheperd দেখলেন যে ইঁদুরের পায়ের পাতাতে কুষ্ঠরোগের জীবাণু বাসা বাঁধতে পারে, তবে খুব বেশী বাড়তে পারে না। এই আবিষ্কারের সাহায্য নিয়েই অনেক ঔষধের পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়। ১৯৭১-৭৪ সালে এক মহিলা বিজ্ঞানী Storrs ও তাঁর সহকর্মীরা বিরাট সাফল্য লাভ করেন আর্মাডিলো নামক প্রাণীটি নিয়ে। দক্ষিণ আমেরিকার এই পিপীলিকাভুক প্রাণীটি স্তন্যপায়ী হলেও দেখতে অনেকটা সরীসৃপের মত। শরীরের তাপমাত্রা অধিকাংশ স্তন্যপায়ী প্রাণীদের তুলনায় কম। এই প্রাণীর দেহে কুষ্ঠরোগের জীবাণু দ্রুত বৃদ্ধি লাভ করে। এর সাহায্যে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা সম্ভব হবে। কুষ্ঠ জীবাণুর রাসায়নিক গঠন, তার Protein, lipid, সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যাবে। (আর্মাডিলোর ব্যাপারটা জানবার পর আমার মনে হল ভারতের পিপীলিকাভুক প্রাণী বজ্রকীট (পেঙ্গোলিন) আর্মাডিলোর সমগোত্রীয় এবং তাপমাত্রা কম। ভারতে এই ধরণের পরীক্ষার পক্ষে অনুকুল হতে পারে। তবে আমার পরিচিতদের মধ্যে এই ব্যাপারে খুব বেশী আগ্রহী কাউকে পাইনি। পরে খোঁজ নিয়ে জানলাম যে পণ্ডিচেরীতে Dr. Bedi এই নিয়ে কাজ আরম্ভ করেছেন। এই বৎসরের (১৯৭৭) Indian Vetenary Journal এর একটি সংখ্যায় দেখা গেল যে Dr. Bedi-র কাজটা এগোতে পারছে না কারণ ওখানকার শিকারীর কাছ থেকে সংগ্রহ করা পেঙ্গোলীন গুলো চটপট মরে যাচ্ছে।) ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দে দেখা গেল কোরিয়ান Chipmunk (এক ধরণের কাঠবেড়ালী) জাতীয় প্রাণী কুষ্ঠরোগের জীবাণু পরীক্ষা করার পক্ষে উপযুক্ত। ভারতের নানা জাতীয় কাঠবেড়ালীকে নিয়ে হয়ত এরকম পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে।

বর্তমান গবেষণার ধারা

কোষ এবং অণুর স্তরে গবেষণা করে দেখা গেছে কুষ্ঠরোগীর কিছু কিছু রক্তকোষ যেমন শ্বেতকণিকা, Macrophage T কোষ, ইত্যাদি সাধারণ মানুষের ওই কোষের থেকে অন্যরকম। Phyto-Haemagglutinin নামক উদ্ভিদজাত প্রোটিনের সাহায্যে সাধারণ শ্বেতকোষের DNA সংশ্লেষণ ১০০ গুণ বেড়ে যায়। কিন্তু Tuberculoid কুষ্ঠের ক্ষেত্রে সেখানে মাত্র ১৬ গুণ বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। Lepromatous কুষ্ঠের ক্ষেত্রে কোন বৃদ্ধি দেখা যায় না। B-কোষ যারা antibody তৈরী করে তারা বেড়ে যায় সংখ্যায়, কিন্তু T-কোষের সংখ্যা বা ক্ষমতা কমে যায়। ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে সুস্থ মানুষের রক্ত-কোষ বার বার কুষ্ঠরোগীর দেহে প্রবেশ করিয়ে রোগীকে সুস্থ করা যায়। আমেরিকা এবং দিল্লীতে এধরনের পরীক্ষা সফল হয়েছে বলে শোনা যায় কিন্তু কুষ্ঠরোগীর রক্তের তরল ভাগের মধ্যেও কিছু পদার্থ থেকে যায় যা রক্তকোষকে অস্বাভাবিক করে দেয়।

সংযোজন ঃ

১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে একটি গবেষণায় দেখা যায় নাকের নিঃসরণে যে কুষ্ঠ জীবাণু বেরিয়ে আসে সেগুলি ২৪ ঘণ্টার পরেও শতকরা ১০০ ভাগ

থাকে। যক্ষা ও কুষ্ঠরোগের জীবাণুর চারিধারে একটা মোমজাতীয় আবরণ রয়ে যায়। এক সময়ে কথা উঠেছিল যে আফ্রিকান পাখী Honey Guide মোমজাতীয় বস্তু হজম করে ফেলতে পারে, তার পেটের থেকে রস বের করে যক্ষা রোগের জীবাণুকে ঘায়েল করা যায় কিনা। জানা গেছে যে এই পাখীর শরীরে একরকম yeast আছে, তার থেকে একরকম উৎসেচক এই মোম দ্রবীভূত করতে সাহায্য করে। কুষ্ঠরোগের জীবাণুর আবরণের ওপর হয়তবা এই পদার্থটিকে ব্যবহার করা যেতে পারে। এই পদার্থ সংগ্রহ করার আরও একটা সহজ উৎস হলো Wax Moth এর শুককীট, যারা মৌমাছি পালকদের এক ভয়ের কারণ। তবে কিনা এই রাসায়নিক পদার্থটি যদি ফলপ্রসূ হয়ও, আসল সমস্যা হবে শরীরে কুষ্ঠজীবাণুর কাছে পৌঁছে দেওয়া। আগেই বলা হয়েছে যে কুষ্ঠজীবাণুর রাসায়নিক বিশ্লেষণ অদূর ভবিষ্যতে ভালোভাবে করা যাবে আর্মাডিলোর কল্যাণে।

—রতনলাল ব্রহ্মচারী

[রচনাটি ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্‌টিক্যাল ইনষ্টিটিউট পিপলস্ কালচারাল ফোরামের সৌজন্যে প্রকাশিত।]

চীনের ইলেকট্রনিক শিল্প ঃ স্বনির্ভরতার পথে উন্নতির একটি নজির

প্রযুক্তির বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ভারত বিদেশী কারিগরির উপর নির্ভরশীল। Electronics ও Telecommunication এর বিষয়ে এটি বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য। সাধারণভাবে মনে করা হয় এ ধরনের উচ্চ মানের কারিগরির ক্ষেত্রে বিদেশী সাহায্য ছাড়া অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। যে সব design এবং process এর উদ্ভাবনার জন্য বিদেশী কোম্পানিগুলি বহু অর্থ ও সময় ব্যয় করেছে তার সুযোগ আমরা এইভাবে খুব সহজেই পেতে পারি—এটাই বলা হয়ে থাকে।

কিন্তু যখন আমরা দেখি কোন একটি দেশ ভারতেরই মত অবস্থায় শুরু করে Electronics ও Telecommunication এর মত জটিল বিষয়ে কোন রকম বিদেশী সাহায্য ছাড়াই যে কোন উন্নত দেশের সমকক্ষ হতে পেরেছে তখন এই মত বা চিন্তাধারা সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মায়।

গত বছর সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দশজন Electronics ও Telecommunication ইঞ্জিনীয়ারের একটি দল চীন দেশে যান—উদ্দেশ্য ছিল সেখানকার কারিগরির মান সম্বন্ধে সরাসরি অভিজ্ঞতা সঞ্চয়। এঁরা যান Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) নামে এক খ্যাতিশীল আন্তর্জাতিক সংস্থার তরফ থেকে, চীনের Electronics Society-র আমন্ত্রণে। দলের অধিনায়ক ছিলেন IEEE-র সভাপতি ডঃ রবার্ট স্যাণ্ডার্স। দলের রিপোর্ট এখনও পুরোটা প্রকাশিত হয়নি, কিন্তু তাঁদের মতামত প্রণিধানযোগ্য। ডঃ স্যাণ্ডার্স এর মতে কারিগরী বিষয়ে চীনের অগ্রগতি আশ্চর্যজনক। ১৯৪৮ সালে চীন ছিল আমদানিকারী দেশ, তখন কিছুই প্রায় সেখানে তৈরি হ'ত না। এখন Telecommunication এর ক্ষেত্রে তাঁরা উন্নত দেশগুলির থেকে কোন কোন বিষয়ে দশ বছর এবং কোন কোন বিষয়ে মাত্র তিন চার বছর পেছিয়ে আছেন।

Carrier Communication (একই তারের মাধ্যমে একসঙ্গে অনেক Telephone Channel পাঠাবার ব্যবস্থা) এর ক্ষেত্রে চীন খুবই উন্নত এবং facsimile transmission এর ক্ষেত্রে তাঁরা সম্ভবতঃ এগিয়েই আছেন। তার সম্ভাব্য কারণ চৈনিক অক্ষরের বিশাল সংখ্যার জন্য সেগুলিকে রোমক অক্ষরের মত সহজে teleprinter বা telex এর জন্য সঙ্কেতবদ্ধ করা সম্ভব নয়। সে ক্ষেত্রে ছবি পাঠাবার জন্য যে facsimile transmission ব্যবহার করা হয় সেটাই অপেক্ষাকৃত সহজ বলে গণ্য করা হয়। দলের সদস্যদের মতে চীন দেশে Carrier Communication এর যন্ত্র তাঁরা যা দেখেছেন তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা অন্য যে কোন উন্নত দেশের সর্বাধুনিক সরঞ্জামের থেকে কোন অংশে কম নয়।

উল্লেখ করা যেতে পারে ভারতের তুলনায় চীনের Electronics-এ অগ্রগতির ব্যবধান আরও দু এক বছর বেশী ছাড়া কম নয় এবং আমরা বলতে পারিনা এর কোন বিষয়ে আমরা অন্যান্য দেশের থেকে এগিয়ে আছি।

চীনে কম্পিউটারের অগ্রগতিও সমান আশ্চর্যজনক। Mini computer তাঁরা ইতিমধ্যেই তৈরি করেছেন এবং সমস্ত যন্ত্রাংশ (components) তাঁদেরই তৈরি। আশ্চর্যের কথাই বটে, কেননা computer-এর যন্ত্রাংশ উৎপাদন মার্কিন কোম্পানিগুলির প্রায় একচেটিয়া। ভারতে যে দু একটি mini-computer তৈরি হয় তার প্রায় সব অংশই বিদেশী। উপরন্তু মনে করা হয় যে solid state component এর উৎপাদনের জন্য বিদেশী (সাধারণত মার্কিন) সাহায্য

অপরিহার্য এবং চাহিদা যথেষ্ট না হলে লাভজনকভাবে যন্ত্রাংশ তৈরি করা সম্ভব নয় ও সেই কারণে সেদিকে চেষ্টাও বড় একটা করা হয় না। চীন দেশের প্রযুক্তিবিদরা স্বীকার করেন computer technologyতে তাঁরা আমেরিকা অপেক্ষা কিছুটা পেছিয়ে আছেন। L. S. I. (Large scale Integration) technologyতে তাঁরা এখনও অনগ্রসর এবং microprocessor (একটি বা দুটি ছোট অংশের এর মধ্যে computer এর Central Processing Unit) তৈরি এখনও তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে তাঁরা আশা করেন খুবই শীঘ্র এই ব্যবধান কমাতে তাঁরা সমর্থ হবেন। বিদেশী সাহায্য থাকা সত্ত্বেও ভারতে L. S. I. technology এখনও প্রবেশ করেনি। বিশেষজ্ঞদের প্রস্তাবিত L. S. I. (Microprocessor, calculator, memory ইত্যাদি) এর কারখানা, Semi-conductor Corporation of India, এখনও অথৈ জলে।

টেলিফোনের ক্ষেত্রে চীনের উদ্দেশ্য এই নয় যে প্রত্যেক পদস্থ কর্মচারীর টেবিলে বা বাড়িতে একাধিক টেলিফোন থাকবে। তাদের উদ্দেশ্য প্রত্যেক সাধারণ মানুষ যেন টেলিফোনের সুযোগ পায়। চীনের সমাজব্যবস্থাই এর কারণ এবং কারিগরি তারই দ্বারা পরিচালিত।

চীন দেশে designer, উৎপাদক ও consumer এক সাথে বসে ঠিক করেন কোন জিনিসটা কেমন হবে, কি রকম দেখতে হবে এবং ঠিক কি কাজ করবে। তাতে উৎপন্ন বস্তু অনেক বেশী কাজের উপযোগী হয়। ক্রেতাকে উপেক্ষা করে, দূরত্ব বজায় রেখে, কেবল market trend ও মুনাফার উপর নজর দিয়ে কোন জিনিসের উপযোগিতা বিচার করা সম্ভব নয়। ডঃ স্যাণ্ডার্স মনে করেন এ বিষয়ে আমেরিকার চীনের কাছে শেখার আছে। আমরা বলব শেখার আছে ভারতেরও।

পরিশেষে এই সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে যে চীন কোন রকম বিদেশী সাহায্য ছাড়াই Electronics ও telecommunication এ ভারতের থেকে বেশী এগিয়ে আছে। ভারতীয় বিজ্ঞানী এবং প্রযুক্তিবিদেরা বিদেশে খুবই উচ্চমানের কাজ করছেন এবং সুনাম অর্জন করছেন। ভারতীয়দের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ আন্তর্জাতিক পত্র পত্রিকায় ঘন ঘন প্রকাশিত হচ্ছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারত সম্পূর্ণভাবে বিদেশী কারিগরির উপর নির্ভরশীল।

পর্যবেক্ষক দলের রিপোর্ট প্রকাশিত হলে এ বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করার ইচ্ছা রইল।

সূত্র: "The Institute", New supplement to IEEE "spectrum", December 1977.

তীর্থঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

Towards a Reorientation of Applied Science and Technology in India

[স্বনির্ভর শিল্প অর্থনীতির ভিত ছাড়া দেশীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বিকাশ সম্ভব নয়। ভারতীয় শিল্প ও বিজ্ঞান ব্যবস্থাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হ'লে গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন ও বিকাশের দিকেই বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে—বিকেন্দ্রীভূত, ক্ষুদ্রায়তন দেশীয় শিল্প ব্যবস্থার ওপর জোর দেওয়া ছাড়া প্রকৃত উন্নতির আর কোন বিকল্প পথ নেই। কয়েকটি সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সে পথে এগোবার শক্তি ও সম্ভাবনার দিকটিকে নজির হিসেবে তুলে ধরে এ বক্তব্যটিকেই বর্তমান প্রবন্ধে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন অর্থনীতিবিদ নির্মল কুমার চন্দ্র।]

1. There is widespread dissatisfaction at various levels about the quality and social relevance of scientific work conducted at teaching institutions and research laboratories in India. While a handful of brilliant scientists working in this country make a strong impact on the international scene, most do not. A very large number also leave the country many of whom again make significant contributions while staying abroad. Hence the basic reason for the current malaise cannot be the intellectual poverty of our scientific community. If the fault does not lie with the calibre of our scientists but with the environment, it has to be located either in the environment in which our scientists work or in the professional goals pursued by them or both. The schematic notes below attempt a very partial diagnosis and an equally partial way out of the impasse. There is no pretention about comprehensiveness.

2. Science is one of the branches of human

knowledge which is universalist in character. A valid proposition in physics or chemistry has to be true irrespective of time and place ; it remains so until it is superseded by a better or a more general theory. Since most scientific advances to day are taking place in a small number of countries in Europe and North America, talented scientists working in India and other Third World countries gravitate towards those fields of research which are considered to be the most important in Western countries.

3. Scientists in the West have typically concerned themselves with problems faced by their own countries. Research facilities offered by external agencies like the government or private foundations or business are exclusively geared to the latter's needs ; this in its turn obliges the scientists to work in areas relevant to their own societies. As a consequence very little of scientific activity goes on in the West which can be directly and fruitfully applied to Third World countries at the present stage of their development. It follows that the 'tailism' of Third World scientists automatically robs most of their research of any immediate usefulness for their own countries. Further, the absence of comparable research facilities in their own laboratories—a factor which is likely to continue because of the meagre resources of the Third World countries —prevents Third World scientists from competing on an equal footing with their Western colleagues. Thus as long as the research priorities in the Third World are guided by ideas emanating from the West, the scientists in the Third World cannot but remain frustrated.

4. In a parallel fashion political leaders, economic planners and a host of other intellectuals in Third World countries have been consciously striving to emulate current Western standards and practices in their efforts to modernize their societies. 'Progress' has in effect meant possession of industries which are as sophisticated as those in the West, having a consumption pattern similar to that in the West, introduction of management styles which accord with the latest Western thinking on the subject, and so on.

5. The consequence of such a notion of progress has been disastrous. Since the end of the British rule in India the Government has implemented a series of Five Year Plans so that the rate of investment in the economy went up at a very fast pace. A large number of new industries were set up. Agriculture also received a big fillip through large irrigation works, use of chemical fertilizers, etc. And yet since the mid-1960's there is an all-round stagnation with production in industry or agriculture barely keeping pace with population growth. The problem of unemployment and underemployment is becoming more and more acute ; current estimates of idle manpower range anywhere between 20 and 50 million man years. Poverty to-day is at least as widespread as it used to be 50 years ago. It would be entirely misleading, however, to suggest that unemployment and poverty are due to one and only one factor, namely, a wrong conception of progress. The absence of adequate land reforms is probably a more fundamental factor ; but there may well exist an organic connection between the two—a question that may be left aside for the present.

6. An almost exclusive reliance on Western (which, for our purposes, includes Soviet) technology in our development plans has led to a number of adverse consequences.

(a) The first and major casualty of this policy is to keep Indian science and technology in a state of stunted growth. Since the latest and the 'best' are always available from abroad, no

demands are placed on the Indian scientific community. Since Indians had no role in the conception or design of plants, the Indian personnel working there are merely expected to follow the manual on operations obtained from abroad. Apart from occasional trouble-shooting activities, quality control and minor R & D on adaptation to indigenous raw materials, etc., the Indian engineering personnel have little creative role to play. As long as Indians hanker after the most uptodate and 'efficient' of technologies, their goal of technological self-reliance will remain a chimera and Indian scientists will continue to play a peripheral role in society.

(b) Technology imports typically involve foreign exchange payments. Quite often foreign private capital is allowed to come in because they alone are supposed to bring in the latest know-how. Payments on account of license fees, dividends, royalties, etc. represent a substantial drain of resources for a country as poor as India is.

(c) Western technology almost necessarily implies the import of all key machinery from abroad. There has undoubtedly been a significant expansion in the machinery sector, but most of such industries are running at very low levels of capacity utilization. For, with the accent on the latest vintage of machinery, the indigenous manufacturers find many of their models outdated by comparison with the West. This is reinforced by the absence of meaningful indigenous R & D. The economic outcome is not only a loss of foreign exchange, but also a severe reduction in domestic investment, production and employment.

(d) With technology and machinery coming from foreign sources, there is often an unnecessary import of raw materials, intermediates, spare parts and components. In respect of each of these imports, including capital goods, Indian manufacturers have little control over prices charged by foreign suppliers since the latter control the technology ; usually, the performance guarantee is given only on the condition that the Indian producers use raw materials, etc. as specified by the guarantors. The situation is much simpler with foreign-owned companies in India whose sole concern is to maximize profits for their parent companies located abroad.

(e) In harmony with the prevailing conditions in the West, a very large amount of capital per worker is required. Hence the consumers' purchasing power created per unit of investment is small, the spread effect (on other industries which might supply the needs of workers in the first industries) is also limited and thus the market as a whole does not expand. In view of the high wages in the West and the very low ones in India, the market-expansionary effect is considerably smaller in India.

(f) In the name of progress industries using modern technology have replaced many labour-intensive traditional crafts. In all Western countries this also happened in the course of industrialization, but by and large those rendered jobless found alternative employment. This was possible because : (i) at the dawn of industrialization there was no backlog of unemployment ; (ii) at any point of time the difference in the labour-intensities of the existing and the new technologies was rather narrow ; and (iii) the introduction of the new technology injected an extra bit of dynamism

into the economy, since the associated machinery and equipment were produced inside the country. In the Indian context all these factors are absent so that the replacement of khadi and handloom by cotton mills, rice-pounding dhenkis by rice mills or husking mills, to name only two items, have immeasurably aggravated the employment crisis. Numerous other examples could be given from the post-1947 period. The Census figures show that the proportion of industrial to total workers have remained stable between 1951 and 1971 despite the heavy rate of investment in industry.

To sum up: indiscriminate adoption of the latest Western technology leads to a stultification of Indian science, excessive outflow of foreign exchange on various counts, low spread effect on domestic production and investment, and a very substantially negative impact on employment.

7. To get out of the impasse one must break away from the stranglehold of Western science and technology. It would be utterly reactionary, however, to do away with all things connected with the West. In each case one has to examine carefully its relevance to the Indian context. Three major criteria (these are by no means exhaustive) should be brought to the forefront: (a) employment, (b) technological self-reliance and (c) economic self-reliance. All three are closely inter-connected. It is difficult to envisage a Western technology which is more labour-intensive than an indigenous one; and if technology is locally available, it is usually associated with a small import bill.

8. For the present analysis one may divide all products into three broad groups.

(a) There will always be certain areas of production which have an over-riding national importance and where there is no substitute for Western technology. Railways, electricity, steel, etc. belong to this category which we may call category A. But was it necessary to introduce diesel locomotives at such a fast pace? Could we not develop more efficient steam engines? Could we not expand our capacity to produce thermal power stations at a faster pace or wait a while before placing orders abroad for super-thermal power stations? Did we have to import all four public sector steel plants?

(b) Then there are a number of products which are consumed mainly by the affluent sections and consequently should have a low social priority. These also involve Western technology and very large scale imports, directly or indirectly. To this B category belong nylon clothing, TV sets, hi-fi electronic equipment, domestic utensils made of aluminium or stainless steel, etc. In some cases there are comparable goods (but not exact substitutes) available in the country produced with local know-how requiring more labour per unit of output.

(c) Finally there are commodities like cotton cloth, shoes, furniture, etc. which may be put in category C that are simultaneously produced in modern factories and in artisanal workshops.

9. Once an overall national perspective is adopted it might seem obvious that an increasing proportion of B and C categories of goods should be produced in small and/or village industries. Yet the reverse is actually taking place as we saw earlier To most people the reason is simple: only the large industries can reap the benefits of scale. Goods would become costlier if the large industries were restricted in scope. But mere 'cheapness' is rarely admitted to be the determining factor. In our country many indus-

trial goods are much costlier than imported ones; only a high tariff wall protects the former. Even in Western countries the farm sector as well as industries like cotton textiles, shoes, etc. exist because of the tariff protection. Thus if India's motor car manufacturers can be heavily subsidized by our policy-makers, what prevents them from affording similar protection to village and small industries against competition from the big industries? Secondly, it is not true that for every product there are technical economies of scale to an appreciable extent. A close scrutiny would reveal that at least in the Indian context large units derive their main advantage from their marketing and financial activities; they are usually able to buy cheaper raw materials, obtain higher prices for their products through their own sales campaigns and outlets, and manage to get credits from banks on much easier terms than smaller entrepreneurs. And in spite of these built-in advantages the large sector has been losing the battle in some fields; production of bicycles and electric fans is now being decentralized with old integrated units unable to compete with consortia of small establishments.

10. Ultimately, small and village industries can flourish if a determined effort is made by them to remove their own organizational and technical deficiencies. Only through their own organization can they put sufficient pressure on the government and other official institutions to pursue a more discriminatory policy in their favour. But scientists and technologists can also make significant contributions.

11. One serve handicap with the small units is that very little of systematic research has been conducted in solving the technical problems faced by them, whereas for big industries there are well-equipped laboratories in this country or abroad. Maintaining the quality of products is an almost universal headache for small units. Quite a lot of hard scientific thinking is required to ensure control over quality for scattered production units with rather scant resources. Devising cheap and mobile instruments may be one way out in several cases; opening industrial estates may be the only solution in some other cases; these and other options need to be explored.

12. Apart from quality control, scientists and technologists can explore the possibilities of reversing the technological trends in selected field, i. e. finding a more efficient and simultaneously more labour intensive technology than the existing one. Given the low wage costs in India the task is by no means hopeless. In effect this means discovering more and more cases like those of bicycles and electric fans already mentioned earlier.

13. Scaling down the plant size is another way of encouraging small industries. In China nation-wide efforts were made to miniaturize a series of plants ranging from chemical fertilizers to cement, motor vehicles and so on. A main advantage is that such small plants can utilize local raw materials and machines, etc. discarded by modern factories. Consequently, overall investments per unit of output is greatly reduced and the advantages often get more pronounced over time.

14. A more intensive research into traditional crafts could at times be highly rewarding. It would be difficult to believe that the design of handlooms evolved a few centuries ago constitutes the last word on the subject. The Khadi and Village Industries Commission has been carrying out researches in these areas, but very much more can still be done. The charka and dhenki (rice-pounder) deserve very serious attention; for, the employment potential of these two devices is for greater than that of almost

anything else one could think of. Other tools and equipment need not be neglected either. It is not unreasonable to hope that in many instances traditional crafts after some research efforts can effectively compete with machine-made products.

15. So far the main focus has been on expanding the frontiers of small and village industries catering to outside (urban) markets. Considering the sheer dimensions of rural unemployment, such a programme can scratch merely the surface of the problem. The main emphasis has to be on production for direct consumption within a small locality, say, a large village or a group of villages. Within such areas one may expect that the growth of village industries will directly subserve the interests of those classes which are presently underemployed and are close to the margin of proverty ; for. these classes could then have a little more work and a slightly higher consumption. The more affluent sections are likely to remain either indifferent or hostile ; these sections obviously would not want to participate manually and in any case they have enough spare cash to purchase whatever they can or want from the urban industries. Insofar as these classes also employ the willage poor as agricultural workers, they may apprehend a rise in agricultural wages once the employment prospects ol the rural poor improve with the opening of village industries.

16. Rural industries on a wide front cannot be sustained unless these are set up on a cooperative basis by the village poor. Individually, none of them can find the means to start any craft ; even if somehow a new craft is initiated by someone it cannot ssurvive in the face of competition. With a cooperative however, the preblem of marketing is eliminated. If the costs of setting up a new unit is equitably distributed, and if the benefits in terms of both employment and consumption goods produced, are also equitably distributed, the cooperative is in principle viable. An illustration may help. Let us suppose that in a village there are one hundred poor peasant families each of which buys cloth to the value of say, Rs. 100 ; assume further that raw cotton accounts for 50% of the value. Once the cooperative is formed, it merely buys raw cotton worth Rs. 500 ; then the job of spinning and weaving is fairly distributed among the member households. On an average each household should then have a spare cash to the extent of Rs. 500 which may be used partly to augment the investible resources of the cooperative and partly to raise the household's consumption (on food or cloth). Such a scheme can work provided : (i) the initial investments to buy raw cotton as well as a small number of charkas and handlooms can somehow be financed and (ii) members refrain from buying cloth from outside. The latter depends entirely on the social consciousness of the village poor ; if this is weakly developed no programme of self-help can succeed. The problem of initial investments can be overcome in a variety of ways. Since the tools in question are fairly simple, these may be prepared by the members themselves with wood from nearby trees. Cash for purchasing raw cotton may be obtained on credit from the regional cooperative bank. For certain schemes like rice-pounding (or simple processing of similar agricultural products), the requirement of initial capital is far less ; but the poor peasants as a group would be able to save the grains they have to pay to the husking mill or rice mill as milling charges.

17. In addition to these two simple crafts, there must be a whole lot of other potential activities given the wide variety of natural and other resources. The gobar gas plant is another obvious scheme to reckon with. Any collective of, say, 100 poor

peasant families is bound to possess at least a score of cattle between them so that a viable plant on a cooperative basis can easily be built. Poor peasants are typically unable to manure their fields adequately ; fertilizers from the gas plant could come in handy. Many other examples could be cited. Further, one may look into ways of improving health and sanitation of the rural poor taking into account their habits as well as resource constraints.

18. In order to make their contribution really effective scientists would have to acquāint themselves thoroughly and at first hand with the conditions of the villages on which they want to focus. The rural population is generally suspicious of outsiders and are unlikely to adopt any scheme unless they feel reasonably satisfied about its viability. Hence something tested in a laboratory or a solution worked out mathematically will have little chance of acceptance unless its feasibility and desirability is visibly demonstrated. Scientists would therefore have to spend a lot of time discussing with the peasants the proposed schemes. Sometimes the peasants themselves may from their practical experience suggest new ideas and methods to solve otherwise baffling problems. Above all, one must gain the confidence of the peasants. An open-ended two-way dialogue and two-level research at the laboratory and in the fields, are the necessary prerequisites for the scientists who want to help the village poor. In order to have an effective communication the scientists must abandon a narrow technological approach. They have also to be acquainted with the socio-economic structure of the villages they choose to work in. Although any scientist with keen powers of observation may more unravel the 'secrets' of that structure it is often helpful to work in a team with social scientists who share a similar perspective. For, the dominance of the affluent sections in most villages is such that the scientists may unwitingly create technologies which would directly increase that dominance. Culturally, urban middle class professionals generally find these affluent sections more accessible then the rural poor ; but once the last group perceives any close nexus between the first two, it is unlikely to offer its cooperation. Hence at the very outset it is desirable for the scientists to have some idea of the village structure, preferably with the help of social scientists, before any concrete schemes are set forth.

19. The themes suggested in the earlier paragraphs are by no means novel. The National Committee for Science and Sechnology (NCST) has been encouraging researches in rural technology. The Council for Scientific and Industrial Research (CSIR) sometime ago 'adopted' the backward district of Karimnagar in Andhra Pradesh ; multidisciplinary teams of scientists intensively surveyed the mineral and forest resources, worked out optimal cropping pattern, explored the possibilities of opening up new agro-based industries, new roads, etc. The Indian Institute of Science, Bangalore, also launched a new cell called ASTRA which has set up a research centre in a selected village where researchers go and stay over extended periods. Many other institutions are also engaged in a piecemeal way in similar activities. In Karnataka, however, thanks to the initiative taken by Karnataka State Council for Science and Technology (KSCST) there is a greater institutional thrust. Whereas previously engineering students worked on their final year projects with a meagre grant of Rs. 50 each, the KSCST now provides a grant of Rs. 1000 each to 10 selected students from each of the 15 engineering colleges who are eager to work on rural technology, living and working in villages of their choice. In this way both students and their teachers get

involved.

20. The importance of the KSCST scheme cannot be overemphasized. Whatever the personal commitment of an individul researcher, unless the work is professionally recognized among the academic community and gets its due place in the professional evaluation of the individual, it will not be easy to sustain the move towards rural technology on a long-term basis. The KSCST scheme precisely helps to integrate such work with the academic curriculum ; variants of this scheme should be explored for other parts of the country.

21. Taking a longer and international perspective, there is a growing awareness among scientists and policy-makers in most Third World countries and even in some Western countries, that the direction of technological research must be altered somewhat. Given the number and quality of our scientific manpower and their proximity to real life problems, India is one of the few countries which can play a leading role in this field. Hence any creative work carried out within a single village may have a far wider significance extending beyond the borders of the village, if not the country.

N. K. Chandra

For all Electrical, Electronic Components and Equipments and any other odd items

Please contact :

D. S. ENTERPRISES

52/9C, B. B. Ganguly Street (1st floor),
Calcutta-700 012

(We also supply Hydrogen, Nitrogen, Oxygen & other cylinders of various capacities ; Silica & Quartz tubes of different sizes)

ফলিত রসায়ন ডিগ্রী—একটি বিতর্ক

ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত রসায়ন বিভাগের দেওয়ালে এখনও কয়েকটি পোষ্টার দেখতে পাবেন যার বয়ান: "কেমিকাল ইঞ্জিনীয়ারিং কেমিকাল টেকনলজি ডিগ্রীর পরিবর্তে কেমিকাল ইঞ্জিনীয়ারিং ডিগ্রী দিতে হবে"। ফলিত রসায়নের ছাত্রদের এই দাবী আজ থেকে প্রায় বছর তিনের আগেকার—ফলিত রসায়নে ডিগ্রী বি টেক ইন কেমিকাল ইঞ্জিনীয়ারিং ও কেমিকাল টেকনলজি থাকবে না বি টেক ইন কেমিকাল ইঞ্জিনীয়ারিং হবে এই বিতর্কের সূত্রপাত তখন থেকেই। এই বিতর্কের অংশীদার বর্তমান ছাত্র, প্রাক্তন ছাত্র ও শিক্ষকেরা। ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কাউন্সিল গত ৯ই মার্চ ১৯৭৮ এর সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে বর্তমান ডিগ্রীর পরিবর্তে বি টেক ইন কেমিকাল ইঞ্জিনীয়ারিং ডিগ্রী দেওয়া হবে। বিষয়টি এখানেই থেমে যায় নি বিতর্ক এখনও চলছে—আর এই বিতর্কের মধ্য দিয়ে ফলিত রসায়ন শিক্ষার সাথে সামাজিক প্রাসঙ্গিকতা ও শিল্পের সাথে সম্পর্ক ইত্যাদি প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

ফলিত রসায়ন বিভাগের ছাত্ররা মনে করেন যে, ডিগ্রী পরিবর্তন একান্ত প্রয়োজন ছিল কারণ: (১) 'কেমিকাল ইঞ্জিনীয়ারিং এণ্ড কেমিকাল টেকনলজি' ডিগ্রী একটি 'জগাখিচুরী' বিশেষ, এই ডিগ্রী শিল্পক্ষেত্রে কেমিকাল ইঞ্জিনীয়ারিং ডিগ্রীর মত স্বীকৃত নয়। শিল্পসংস্থাগুলিতে চাকরির ক্ষেত্রে পুরনো ছাত্ররা এই অসুবিধের সম্মুখীন হয়েছেন। (২) পরিবর্তিত ডিগ্রী শিল্পের ক্ষেত্রে অনেক বেশি সুনির্দিষ্ট হবে এবং শিল্পসংস্থায় চাকুরির সুযোগ বাড়বে। (৩) কেমিকাল ইঞ্জিনীয়ারিং ডিগ্রীতে চাকরির সুযোগ বাড়বে কারণ এখন যারা কেমিকাল ইঞ্জিনীয়ারিং স্পেশালাইজেশন নেয় তারা চাকরিতে অগ্রাধিকার পায়। (৪) ডিগ্রীর পরিবর্তনের সাথে সাথে পাঠ্যসূচির পরিবর্তন হবে এবং সেটা এমনভাবেই হওয়া উচিত যাতে শিল্পের সাথে তার সম্পর্ক থাকে। এ ছাড়াও শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিদের দিয়ে পড়ানোর প্রথা চালু করা প্রয়োজন। বর্তমান ডিগ্রীর পরিপ্রেক্ষিতে যে পাঠ্যসূচী আছে তার তত্ত্বগত দিকটাই প্রধান, ব্যবহারিক দিকটা গৌণ। তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক দিকের মধ্যে সামঞ্জস্য-বিধান করতে হবে।

১৯৭৫ সালে ফলিত রসায়ণ বিভাগের ছাত্ররা নিম্নলিখিত দাবীগুলি নিয়ে আন্দোলন শুরু করে: (১) রাবার ও প্লাষ্টিকস টেকনোলজিতে এম, টেক কোর্স চালু করা; (২) কেমিকাল ইঞ্জিনীয়ারিং ও কেমিকাল টেকনোলজি ডিগ্রীর পরিবর্তে বি টেক ইন কেমিকাল ইঞ্জিনীয়ারিং ডিগ্রী চালু করা; (৩) কেমিকাল ইঞ্জিনীয়ারিং কোর্সের পাঠ্যসূচীতে ফ্যাকটরী ট্রেনিং অন্তর্গত করা; (৪) লেবরেটরীর সুযোগ সুবিধে বাড়ানো—যেমন, ইউনিট অপারেশন লেবরেটরী, মেকানিকাল ইঞ্জিনীয়ারিং লেবরেটরী, সিলিকেট লেবরেটরী, ইত্যাদি; (৫) লাইব্রেরীর সুযোগ সুবিধা বাড়ানো; (৬) শিল্পমুখী পাঠ্যসূচী—বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে শিল্পসংস্থাগুলির সম্পর্ক সৃষ্টি। এ ছাড়া, বি টেক, এম টেক-এ যে প্রোজেক্ট করতে হয় সেগুলি শিল্পসংস্থার সমস্যা নিয়ে করা—যেমন আই-সি-আই-এর কন্‌ডেনসার টিউবের সমস্যা। (৭) অন্যান্য ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের মত ক্যাম্পাসে কর্মসংস্থান অফিসার নিয়োগ।

এই আন্দোলন 'কালা-দিবস' পালন, অবস্থান ধর্মঘট, অনশনে রূপ নেয়। পরের বছরের ছাত্ররা ডিগ্রী পরিবর্তনের আন্দোলনকে জোরদার করে তোলে।

বর্তমান ছাত্রদের মতে প্রাক্তন ছাত্রদের শতকরা ৯০ জনই এই ডিগ্রী পরিবর্তনের পক্ষে—কারণ, এর মধ্য দিয়ে চাকুরির যেমন সুযোগ সুবিধা বাড়বে তেমনি শিল্পসংস্থায় প্রয়োগ করার মত ব্যবহারিক শিক্ষাও পাওয়া যাবে।

ডিগ্রী পরিবর্তনে শিক্ষকদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। একাংশ শিক্ষকের মতে এই পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত যথাযথ নয় কারণ—(১) এই পরিবর্তনের ফলে ফলিত রসায়ন বিভাগ আর একটি কেমিকাল ইঞ্জি-নীয়ারিং প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে—এই বিভাগের অন্যান্য শাখা যেমন সিলিকেট টেকনোলজি, ফুড এণ্ড বায়োকেমিট্রি, অয়েল এণ্ড ফ্যাট, ইত্যাদি অবহেলিত হবে। (২) এই বিভাগে গোড়া থেকেই শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল কেমিকাল ইঞ্জিনীয়ারিং ও কেমিকাল টেকনোলজির বিভিন্ন শাখায় বিশেষজ্ঞ তৈরি করা। কেমিকাল টেকনোলজির বিভিন্ন শাখা অবহেলিত হলে এই বিভাগের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে। (৩) গত তিরিশ বছরে আমাদের দেশে অনেক কেমিকাল ইঞ্জিনীয়ারিং প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে কিন্তু কেমিকাল টেকনোলজি সেই পরিমাণে গুরুত্ব পায় নি। কেমিকাল টেকনোলজিকে বাদ দিয়ে রাসায়নিক শিল্পের কথা ভাবাই যায় না। ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত রসায়ন বিভাগই কেমিকাল টেকনোলজিতে উচ্চতর অধ্যয়ণ ও গবেষণার কেন্দ্র। (৪) যখন স্বনির্ভরতা ও নিজস্ব কারিগরির কথা বিশেষ করে ভাবা হচ্ছে, যখন ক্ষুদ্র গ্রামীণ শিল্পের প্রতি জোর দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে তখন কেমিকাল টেকনোলজিষ্টদের প্রয়োজন আরও বাড়বে। কেমিকাল ইঞ্জিনীয়াররা যেখানে প্ল্যন্ট চালানো, প্রতিপালন ও ডিজাইন করে থাকেন সেখানে কেমিকাল টেকনোলজিষ্টরা উৎপাদন পদ্ধতির দিক, গবেষণা ও উন্নয়নের দিকগুলি দেখে থাকেন। অতএব, কেমিকাল

টেকনোলজিষ্টদের প্রয়োজনের কথা ভেবে এই পরিবর্তন বাঞ্ছনীয় নয়। (৫) কেমিকাল ইঞ্জিনীয়ারিং ও কেমিকাল টেকনোলজির পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট বোর্ড অব স্টাডিসের সুপারিশের বিবেচনা না করে এই পরিবর্তন করা হয়েছে। এমনকি গণি কমিটির মন্তব্য অনুযায়ী আরও বেশি সংখ্যায় কেমিকাল ইঞ্জিনীয়ারিং-এ গ্রাজুয়েট আমাদের প্রয়োজন হবে কিনা সে সম্পর্কে সন্দেহ আছে। সংশ্লিষ্ট সমস্ত মহলের সাথে আলোচনা করেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। একটি বিশেষজ্ঞ কমিটির মতামত নিতে পারলে সবচেয়ে ভাল হয়—যে কমিটি ছাত্র, শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট সমস্ত মহলের সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবে।

অপর অংশ শিক্ষকদের মতে এই ডিগ্রী পরিবর্তন প্রয়োজন ছিল। কারণ, (১) রসায়ণ শিল্পের বিকাশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি পাঠ্যসূচীর প্রয়োজনে এই পরিবর্তন কাম্য। বর্তমানে যে পাঠ্যসূচী আছে তা অনেকাংশেই আধুনিক শিল্পের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হয়। (২) এই পরিবর্তনে টেকনলজি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এই ধারণাটি ভুল। ইঞ্জিনীয়ারিং ও টেকনোলজির যে অর্থ করা হচ্ছে তাও সঠিক নয়। একজন কেমিকাল ইঞ্জিনীয়ারকে প্ল্যাণ্টে ওয়াকিবহাল হওয়া ছাড়াও যে রাসায়নিক পদ্ধতিগত দিক আছে সেগুলি জানতে হবে ও শিল্প সমস্যা মোকাবিলা করতে হবে। এই ডিগ্রীকে কার্যকরী করতে হলে সেই অনুযায়ী পাঠ্যসূচী করতে হবে পাঠ্যসূচীর পরিবর্তনের ফলে টেকনলজি ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। কেমিকাল ইঞ্জিনীয়ারিংয়ে যে সমস্ত টেকনলজি বিভাগ আছে সেগুলি ইলেকটিভ সাবজেক্ট হিসেবে ছেলেরা পড়বে। শিল্প ক্ষেত্রে যাতে সেই সব বিভাগে তারা একজন কেমিকাল ইঞ্জিনীয়ারের দায়িত্ব সার্থকভাবে পালন করতে পারে তা নির্ভর করবে কোন কোন বিষয়ে তারা কিভাবে পড়ে যাচ্ছে এবং সমস্যাগুলি সঠিকভাবে সমাধান করতে পারছে কি না তার ওপর এই জন্য পাঠ্যসূচীতে তারা শিল্প সমস্যাগুলিকে প্রোজেক্ট হিসেবে নিতে বলছেন। যে প্রোজেক্টগুলি করার সময় একজন ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের, একজন টেকনলজি বিভাগের শিক্ষক থাকবেন ছাত্রের সাথে সেই প্রোজেক্ট আলোচনা করার জন্য। (৩) পরিবর্তিত ডিগ্রীর ফলে চাকুরির সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। অন্তত আগামী কয়েক বছরে কেমিকাল ইঞ্জিনীয়ারের চাহিদা বাড়বে। (৪) জনৈক শিক্ষকের মতে 'ডিগ্রী পরিবর্তনের চেয়ে বড় কথা হ'ল পাঠ্যসূচীর পরিবর্তন। পাঠ্যসূচীর পরিবর্তন একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল।'

পাঠ্যসূচীর পরিবর্তনে ছাত্রদের অভিমত হল তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক দিকে এখন যে আনুপাতিক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে (৭ : ৩) সেট ১ : ১ করলে ব্যবহারিক দিকও যথাযথ গুরুত্ব পাবে। এছাড়া যে ইলেকটিভ সাবজেক্ট থাকবে তা মোট নম্বরের শতকরা দশভাগ (৩০০ নম্বর থিওরি ২০০ ; প্রাকটিকাল ১০০) হওয়া উচিত (সর্বভারতীয় পাঠ্যক্রম বিচারে ইলেকটিভে শতকরা ৮ ভাগ পড়তে হয়)। ড্রইংয়ে নম্বর বাড়াতে হবে। প্রসেস কনট্রোল লেবরেটরী স্থাপন করতে হবে। যে পাঠ্যসূচী ছিল, ছাত্রদের মতে, তা পড়ে শিল্পক্ষেত্রে কাজ করতে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। বেশি তাত্ত্বিক ঝোঁক থাকার ফলে গবেষণা ও উন্নয়ন (R & D) বিভাগের পক্ষে বিছুটা উপযুক্ত হলেও গবেষণা ও উন্নয়ন খাতে মোট ব্যয়ের শতকরা ০৬ ভাগ ব্যয় হয়ে থাকে সেই জন্য এই ক্ষেত্রও খুবই সীমিত। শিল্পক্ষেত্রের সমস্যা সমাধান করার ক্ষেত্রে যে অসুবিধার কথা ছাত্ররা বলছেন কোন কোন মহলের মতে, এই বিভাগের বহু প্রাক্তন ছাত্র শিল্প ক্ষেত্রে দায়িত্বপূর্ণ পদে তা হলে বহাল থাকতে পারতেন না। আবার কেমিকাল ইঞ্জিনীয়ারীং ডিগ্রী হলে যে চাকুরির সুযোগ বাড়বে তা নিয়েও মতভেদ আছে।

এই বিতর্ক আপাতদৃষ্টিতে যে স্তরেই হোক না কেন এর মধ্য থেকে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বেরিয়ে এসেছে। ফলিত রসায়ণ বিভাগে ডিগ্রীর উদ্দেশ্য কি, পাঠ্যসূচী কি হওয়া উচিত, পঠন পাঠনের সাথে প্রকৃত সমস্যার সম্পর্ক কি হতে পারে, শিল্পের সাথে এই উচ্চতর অধ্যয়ণ ও গবেষণাকেন্দ্রের সম্পর্ক কি হতে পারে ইত্যাদি প্রশ্নও এই প্রসঙ্গে আলোচিত হচ্ছে। গত ষাটের দশক থেকে সারা দেশ জুড়ে যে অর্থ-নৈতিক সংকট দেখা দিয়েছে যার ফলে ইঞ্জিনীয়ারীং গ্রাজুয়েটরা বেকার হতে শুরু করল সেই সংকটেরই করাল ছায়া এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের ওপরও বর্তাচ্ছে। শিল্পে সংকটের ফলে কেমিকাল ইঞ্জিনীয়ারীং ও সেরামিক টেকনলজি ছাড়া ছাত্ররা কয়েক বছর ধরেই অন্যান্য শাখা-গুলিতে ভর্তি হতে চাইত না। অতএব চাকরির সুযোগ পাওয়া যাবে কি না এটা মূল বিষয় হয়ে দেখা দিয়েছিল। সেইজন্য ফলিত রসায়ণের এই বিতর্ক অনেক গভীরে নিহিত রয়েছে। ভারতবর্ষে রাসায়ণিক শিল্পের বিকাশ যদি যথাযথ হয় এবং যদি স্বনির্ভর শিল্প বিকাশের নীতি গ্রহণ করে, যদি বিদেশী সহযোগীতার শৃংখলে বাঁধা পড়ে না থাকে তা হলে আমাদের দেশের কেমিকাল ইঞ্জিনীয়ারদের বা কেমিকাল টেকন-লজিষ্টদের আজ এই সংকটের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয় না, পরস্পরকে প্রতিদ্বন্দ্বী বলে ধরতে হয় না, পরস্পর পরিপূরক ভূমিকা পালন করতে পারে। আমাদের দেশে ছোট, মাঝারি ও বড় রাসায়নিক শিল্পের যথেষ্ট প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও উচ্চতর গবেষণা ও অধ্যয়ণ কেন্দ্রের ডিগ্রীধারী ছাত্রদের কেন এই চাকরির সংকট, রাসায়নিক শিল্পের সাথে উচ্চতর রসায়ণ শিক্ষার এই দুরত্ব কেন—আগামী দিনে আমাদের এই প্রশ্নগুলির উত্তর খুজতে হবে।

['বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' পত্রিকার তরফ থেকে ফলিত রসায়ন বিভাগের কয়েকজন ছাত্র ও শিক্ষকের সাথে বিষয়টি নিয়ে আলাপ আলোচনা করে নিবন্ধটি রচনা করেছেন পার্থ সেন।]

International Cancer Congress ('78) in Argentina— A Call for Relocation or Boycott

আর্জেন্টিনার বুয়েনাস এয়ার্সে ১৯৭৮ সালের অক্টোবর মাসে আন্তর্জাতিক ক্যানসার কংগ্রেস হবার কথা। কিন্তু কিছু খ্যাতনামা মার্কিন ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানী আর্জেন্টিনার স্বৈরাচারী সরকারের ব্যাপক দমনমূলক নীতি ও কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ ক্যানসার কংগ্রেসের স্থান পরিবর্তনের দাবী জানিয়েছেন। তা না হলে তাঁরা কংগ্রেস বয়কট করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং সেই মর্মে অন্যান্য দেশের বিজ্ঞানীদের কাছেও আবেদন করেছেন। নিবন্ধটি এই প্রেক্ষাপটেই রচিত। আবেদনটিও এখানে হুবহু প্রকাশ করা হ'ল।

At least a part of the U. S. Scientists and their community cohorts in Europe seem to have come out of their ivory-tower isolation from the broad masses. The International Cancer Congress (1978) is scheduled to be held in October in Buenos Aires (Argentina). But a section of the U. S. scientists and physicians has justifiably issued a call(1) for relocation of the Congress or boycott as a mark of protest against the ruthless repression of the scientists and the people of the country by the military Junta. The proponents of the boycott slogan suspect —and not without reason—some foul motivation behind this site selection. Dr. Humberto Veronesti, President of the International Union Against Cancer is quoted as having said "I believe that to choose Buenos Aires for this meeting is one of the most intelligent action taken by the Union."(2) This type of utterances suggests that the Argentinian generals have already invested high hopes in a "business as usual" Congress as a measure of international acquiescence of their misdeeds and misrule. So the boycottists are rightly bent on not permitting one thing: "that the Argentinian Government should use the success of the Congress to claim to the world that the Scientific Community condones its present policies by being present at the meeting and keeping silent about the plight of the Argentinian Scientists."(2)

The boycott slogan has by now gained some momentum, even if not a 'decisive response'. As the report goes, the number of its advocates is daily increasing all over the world. That all's not well with the organisers of the Congress would be clear from a statement of Gregory O'Conor, N C I associate director for International Affairs: "I have the sense that the boycott will be effective in that a number of our top scientists will not be going and I think that this will be a loss to the Congress."(3)

> Among the many well-known scientists who have publicly protested against the terrorising policies of the military Junta are Nobel Prize WinnersLonis Ne'el, Alfred Kastler, T Sung Dao Lee and Hans Bethe.
>
> —New York Times, Nov. 27,1977.

Of course, some Scientists fail to see any relationship between the Cancer Congress (78) in Argentina (which, to them, is—naively or pretentiously—an out-and-out academic affair), and the Argentinian Government. According to them the boycottists' initiative "directly affects not only the organising Committee and the participants of the Congress but also those who are interested in problems related to Cancer who have no responsibility whatever for the cited abrogation of human rights."(4)

In reply to these arguments the first point we have to say is that the trouble and controversy could have been completely avoided by a sheer change of place which was not a very difficult task to do within a year, if ego and political motivation on the part of the organisers were not at play. Secondly echoing the words of Guy Tassart we retort that "antiscience sentiments will certainly not be aggravated by a public stance against torture and death. Many lives may instead be spared."(2) It must not be forgotten that the fight against Cancer is for the protection of people which is very much in peril in Argentina and it is the people who are the wealth and the last weapons of science.

The following is the full text of the appeal of Baltimore and others.(1)

"The undersigned physicians and scientists engaged in Cancer research and patient care are deeply concerned by the flagrant abrogation of human rights in Argentina, the country in which the 12th International Cancer Congress is Scheduled to be held on Oct. 5-12, 1978 at Buenos Aires. Recent reports [Nicholas Wade, Science, 194, 1397 (1976) : Repression in Argentina : Scientists caught up in tide of terror] leave little doubt that scientists, physicians, professors, journalists, intellectuals and other citizens have been arrested, imprisoned without benefit of habeas corpus, often tortured, and sometimes executed without trial. We cannot in good conscience condone such actions, nor can we participate in an International Cancer Congress however worthy its cause, if it is held in Argentina. To prevent the adverse impact which such a boycott might well have on the international effort against Cancer, we call upon the officers of the International Union Against Cancer (U. I. C. C.) to convene an emergency session for the purpose of considering an alternate venue for the 12th International Cancer Congress in 1978.

"We invite U. S. Scientists and physicians who share these views to join us in signing this petition. Copies will be made available on request to Dr. Henry Rappaport, City of Hope National Medical Centre, 1500 East Duarte Road, Duarte, California 91010.

"We understand that similar actions are now under way in Canada and France. We hope that colleagues in all the countries which are signatories of the Helsinki declaration of Human Rghts will join in this protest."

(i) Divid Baltimore, Center for Cancer Research, M. I. T.

(ii) Emil Frei, I. I. I Sidney Farber Cancer Institute, Massachusetts.

(iii) Henry S. Kaplan, Cancer Biology Research Lab., Stanford Union Med. Centre, Stanford.

(iv) Henry Rappaport, City of Hope National Medical Centre,

(v) Howard M. Temin, Mc. Ardle Memorial Laboratory for Cancer Research, Univ. of Wisconsion.

At last we appeal to our Indian Cancer researchers, scientists and specialists in the field to refrain from joining the Congress ('78) in Argentina, to uphold the cause of the just and thus to set a glorious example in the annals of Indian Science.

S. Bhattacharyya

References :

1. D. Baltimore and others, SCIENCE, 198 No. 4314, p 253, 21 Oct, '77
2. G. Tassart, NATURE, 971 No. 5641, p 107, 12 Jan, '78
3. Science Correspondent, SCIENCE, 199 No. 4329, p 666, 10 Feb, '78
4. A. F. Montoro, SCIENCE, 199 No. 4328, p 480, 3 Feb, '78

['বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' মে-জুন ১৯৭৮ সংখ্যায় আরজেনটিনায় বিজ্ঞানকর্মীদের ওপর দমন ও অত্যাচারের ওপর একটা নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। পাঠককে প্রবন্ধটা পড়তে অনুরোধ করা হচ্ছে। প্রসঙ্গতঃ, ঐ প্রবন্ধের লেখকের নাম (সুনীল মুখার্জী) ভুলক্রমে ছাপা হয় নি। এর জন্য আমরা দুঃখিত। সম্পাদকমণ্ডলী।]

চিঠিপত্র

সম্পাদক, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

মাননীয় মহাশয়

আপনার পত্রিকায় প্রকাশিত (জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৭৮) আমার "বিজ্ঞানের ইতিহাসের ভূমিকা" প্রবন্ধের উপর শ্রীঅমিতাভ দত্ত ও সুনীল মুখার্জী মন্তব্য করে যে আলোচনার সূত্রপাত করেছেন তার জন্য তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। প্রথমেই বলে রাখতে চাই যে আমার ছোট প্রবন্ধটিতে গুরুতর এত বিষয়ের সন্নিবেশ ছিল যে এই স্বল্পপরিসরে কোনটাই পরিষ্কার করে বলা সম্ভব ছিল না, আর তার সাথে সাধারণ এক বিজ্ঞানকর্মীর সীমাবদ্ধতাও যুক্ত হয়েছিল।

প্রবন্ধে এটা বলা হয়েছে বিজ্ঞানের অগ্রগতি পারিপার্শ্বিক ও সামাজিক চাহিদার দ্বারা মূলতঃ নিয়ন্ত্রিত হলেও বিজ্ঞানের একটি আভ্যন্তরীণগতিও আছে এবং বিজ্ঞানের অগ্রগতি সামাজিক উন্নতিকেও প্রভাবান্বিত করে। যেহেতু সমাজবাদের দার্শনিক ভিত্তি বৈজ্ঞানিক দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত সুতরাং যা বিজ্ঞানকে এগিয়ে নিয়ে যায় (অন্ততঃপক্ষে মধ্যযুগে) তা সমাজকেও (ইউরোপীয় নবজাগরণের মধ্য দিয়ে ধনতন্ত্রের পথে, অতএব চরমবিচারে সমাজতন্ত্রের দিকে) এগিয়ে নিয়ে যায়। বেকনের সময় (ষোড়শ শতাব্দীতে) নিশ্চয়ই আজকের মত করে সমাজতন্ত্রের ধারণা করা সম্ভব ছিল না। সমাজ বিজ্ঞানের প্রবর্তক মার্কস চিন্তাকে বাস্তবের সাথে যুক্ত করতে এবং দর্শনকে শুধুমাত্র নানাভাবে বিশ্বকে ব্যাখ্যা করে ক্ষান্ত না থেকে বাস্তব প্রয়োগের মধ্য দিয়ে মানব সমাজকে পরিবর্তন করার কথা বলে দর্শনে বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন। সুতরাং যিনি জ্ঞানকে বাস্তব পরীক্ষা, পর্য্যবেক্ষণ ও গণিতের সাহায্যে সুদৃঢ়ভিত্তির উপর স্থাপন করতে বলে বিজ্ঞানকে মধ্যযুগে মুক্ত করেছিলেন, বিজ্ঞানের মুক্তিদাতা সেই রোজার বেকন সমাজতন্ত্রের পথে মানুষের মুক্তি প্রচেষ্টাকে কোনভাবেই কি এগিয়ে দেন নি ?

ডারউইনের বিবর্তনবাদ সম্বন্ধে J.B.S. Haldane এর মন্তব্য উদ্ধৃত করে পত্রলেখকরা যদি ডারউইনীয় বিবর্তনবাদকে মৃত অতীতের আঁস্তাকুড়ে ফেলতে চেয়ে থাকেন তবে আমি তাঁদের সাথে একমত নই। শ্রীমুখার্জী ও শ্রীদত্তকে অনুরোধ করবো তাঁরা যেন বিংশ শতাব্দীর শেষপাদের জীব-বিজ্ঞানের 'জ্ঞান' নিয়ে প্রায় সওয়া শ' বছর আগেকার ডারউইন মতবাদকে সদৃষ্টি, উপযুক্ত মর্যাদা ও সহানুভূতি সহকারে বিচার করেন। পরবর্তী-কালের (ডারউইনের কাছে অজ্ঞাত) মেণ্ডেলীয় তত্ত্ব, জীনতত্ত্ব এবং molecular biology-র অন্যান্য আরো আবিষ্কার ডারউইনের বিবর্তন-বাদকে আরো পরিপুষ্ট, পরিচ্ছন্ন করে এগিয়ে নিয়ে গেছে।

ডারউইনের ধারণা অনুযায়ী পৃথিবীতে বেঁচে থাকবার জন্য জীবকে সংগ্রাম করতে হয় (struggle for existence)। পৃথিবীর নানাস্থান থেকে সংগৃহীত বিপুল তথ্য থেকে ডারউইন দেখালেন যে বংশধারার মধ্য দিয়ে সূক্ষ্ম ও সামান্য হলেও পরিবর্তন (variation) হয়। জগতে টিঁকে থাকবার জন্য উপযুক্ত ও কাম্য পরিবর্তনগুলি বংশধরদের ভিতর সঞ্চালিত হয় ও কালক্রমে প্রজাতির (species) উৎপত্তি হয়। এই ঘটনাগুলিকে বর্তমান বিজ্ঞান আরো ভালো করে বুঝেছে মাত্র, ডারউইন তত্ত্ব ভুল প্রমাণিত হয়নি। "He (Darwin) proposed a hypothesis on heredity and variation that has turned out to be completely wrong. The interesting point here is that there errors did not in the least vitiate the theory of natural selection as far as Darwin had carried it. Its main features did not and still do not depend on the genetic substrate (p 12)....It is thoroughly established that natural selection is the essential orienting or directive factor in evolution....Natural selection is a very complex process that is inadequately, in certain caaes quite falsely, summed up in the phase "survival of the fittest...."

"In the first place, natural selection does not directly favour fitness in the common sense of the word (eg. good health strength, agility intelligence and so on). What it favours is effective genetic controls for efficient reproduction over long periods of time (p 121).

(Biology and Man, by G. G. Simpson. Harcourt Brace & World Inc, New York. 1969)

অন্যান্য বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব থেকে ডারউইনের বিবর্তনবাদ একেবারেই ভিন্ন, কারণ একে পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করা কঠিন। Variation ও তার Natural Selection হয় অত্যন্ত ধীরে। বর্তমানে মনে করা হয় অতিজাগতিক রশ্মি, প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয়তা, পৃথিবীর ভৌতিক, রাসায়নিক ও ভৌগলিক পরিয়র্তনের ফলে নানাভাবে (সম্ভবতঃ বিবিধ রাসায়নিক দ্রব্য, abnormal metabolites দ্বারা) genetic structure এ পরিবর্তন ঘটতে পারে।

Natural Selection এর চালুনীর সাহায্যে যারা পৃথিবীতে টিকে থাকবার অযোগ্য তারা বিনষ্ট হয়ে যায়। কারা টিকে থাকে? যারা সবচেয়ে বেশী উপযুক্ত। এই survival of the fittest তত্ত্বকে কেন্দ্র করে যত গোলমাল যত ভুল বোঝাবুঝি। শ্রীমুখার্জী ও শ্রীদত্ত সঠিক ভাবেই বলেছেন যে ডারউইন মতবাদকে ভিত্তি করেই পাশ্চাত্য দেশে Social Darwinism এর তত্ত্ব আনা হয়েছে এবং eugenics-কে politics-এ অপব্যাবহার করে আমেরিকাতে অশ্বেতাঙ্গ গরিবদের জীবনসংগ্রামে কম উপযুক্ত বলে তাদের উপর পীড়নমূলক আইন করা হয়েছে। এবং এই তত্ত্বের সাহায্যে বার্ণালের ভাষায় (Science in History by J. D. Bernal Vol. 2) "মানুষের দ্বারা মানুষকে নির্মম শোষণ, উন্নত ও সবল জাতি কর্তৃক অনুন্নত ও দুর্বল জাতিকে পদানত রাখার মত সবরকম কাজের ন্যায্যতাই ধনতান্ত্রিক দুনিয়ায় প্রতিপালন করা হয়েছে। এর থেকে অনুপ্রেরণা ও নৈতিক সমর্থন নিয়ে হাক্সলি '৩০ এর দশকের শুরুতে জীবন সংগ্রামে কম উপযুক্ত বলে ইংলণ্ডের শ্রমিকদের আইন করে জন্ম নিয়ন্ত্রণ করবার কথা সুপারিশ করেছিলেন। ডারউইনের তত্ত্বের সঠিক বৈজ্ঞানিক দিকটিকে পাশ কাটিয়ে তাকে বিকৃত করে শ্রেণীস্বার্থে কাজে লাগানো হয়েছে। আজ-কাল এটা বৈজ্ঞানিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত যে সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষের উন্নতির সম্ভাবনা ও সুপ্তপ্রতিভা প্রায় একই রকমের। তার প্রমাণ দেখা যায় রাশিয়া, চীন প্রভৃতি দেশের অসামান্য উন্নতিতে।

পরিবর্তন একটা চান্স মাত্র, একটা random phenomenon-এই ইঙ্গিত বহনকারী Non-Darwinian Evolution বৈজ্ঞানিক-ভাবেই মোটেই প্রতিষ্ঠিত নয়। গভীর বিশ্বাসগুলি নিয়ে যে সব সমাজকর্মী সমাজ পরিবর্তনের কাজ করেন, non-Darwinian evolution-এর ভুল কথা বলার অর্থ হল তাদের কর্মোদ্যমের মূলে আঘাত করা। অনুন্নত সমাজ যে উন্নততর সমাজে পরিবর্তিত হতে পারে সেই বিশ্বাসের মূলেই আঘাত করা হয়।

ডারউইনতত্ত্বে জীবের সাথে প্রকৃতির মিথস্ক্রিয়াকেই (inter-action) struggle for existence বুঝতে হবে। কিন্তু খুব ভালো পর্য্যবেক্ষক ও পরীক্ষাদক্ষ বৈজ্ঞানিক হওয়া সত্বেও ভাষা প্রয়োগ ও দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টিতে তাঁর কিছু বিচ্যুতি ছিল (A short History of Scientific Ideas to 1900 by Charles Singer, ELBS 1959 P 510)। ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লবের স্মৃতিতে ভীত নৈরাশ্যবাদী পণ্ডিত পাদ্রী ম্যালথাসের তত্ত্ব ডারউইন পড়েন ১৮৩৮ সালে এবং জিওলজিষ্ট লায়েলের বিবর্তনবাদের তত্ত্ব পড়েন ১৮৩১ সালে এবং দুটি আইডিয়া ১৮৫৯ সালে ওয়ালেসের সাথে প্রকাশিত The Origin of Species by Natural Selection গ্রন্থে রূপ নেয়। ম্যালথাসের ভুল তত্ত্ব থেকে আইডিয়া নেওয়ার ফলে পরবর্ত্তীকালে তাঁর তত্ত্বকে সহজেই সমাজে অপপ্রয়োগ করা সম্ভব হয়, যার জের আজো চলছে। এই অপপ্রয়োগকে বিরোধিতা করে ডারউইন তত্ত্বকে বর্তমানের আলোয় সঠিক বুঝতে হবে। মার্কস এর ভিতর dialectical materialism-এর practical proof পেয়েছিলেন, সুতরাং সমাজতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষীদের একে স্বাগত জানাতেই হবে। ডারউইন নিজে ঈশ্বর সম্বন্ধে বা মার্কসীয় দর্শন সম্বন্ধে কি ধারণা পোষণ করতেন তা যতটা না গুরুত্বপূর্ণ, তার থেকে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ তাঁর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সামাজিক বার্তা অর্থাৎ তা থেকে উদ্ভূত দর্শন। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ব্যক্তি থেকে আলাদা হয়ে যায়। ঈশ্বরাভিত্তিক এক ভাববাদী দর্শনের মূলে ডারউইনের আবিষ্কার আঘাত করেছিল, তাই চার্চ ও সামন্তশ্রেণীরা এর বিরোধিতা করেছিল। বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের অন্যতম স্রষ্টার কথা দিয়েই আলোচনা শেষ করছি।

'১৮৮৩ সালের ম্যানিফেস্টোর জার্মান সংস্করণের ইংরেজী অনুবাদের ভূমিকায় আমি (এঙ্গেলস্) লিখেছিলাম।

"ডারউইন মতবাদ জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যা করেছে, আমার মতে এই সিদ্ধান্ত (এঙ্গেলস কৃত মার্কসীয় সমাজ বিজ্ঞানের সার) ইতিহাসের বেলায় তাই করতে বাধ্য।" '

মণীন্দ্র নারায়ণ মজুমদার

With best wishes :

CHEMIE FIRMA

Chemical Process consultant and
Order Supplier.

60/1, Hazra Road,
Calcutta-700 019

যোগাযোগের ঠিকানা : **বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী**, C/o. ভি. এস. এন্টারপ্রাইজেস, ৫২/৯/সি, বি. বি. গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০১২

সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে অভিজিৎ লাহিড়ী কর্তৃক সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার সম্পাদক রবীন মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও মুদ্রাকর প্রেস, ১০/১সি, মারহাট্টা ডিচ লেন, কলিকাতা-৭০০০০৩ হইতে মুদ্রিত।

প্রভিসনাল রেজিষ্ট্রেশন নং : ৪৯/৭৮